উগান্ডায় সাহায্যের রাজনীতি

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

পশ্চিমের চোখে আফ্রিকার দেশ উগান্ডা যেন 'সুবোধ বালক'। কারণ অনেকগুলো। আশির দশকে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার ছিল ২৪ শতাংশ। বর্তমানে ৬ শতাংশ। জোরেশোরে ব্যক্তি খাত বিকশিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৬% হারে। ১০ বছরে দারিদ্র্য ৫৬ ভাগ থেকে কমে ৩৮-এ নেমেছে। কাজেই বানের জলের মতো দেশটিতে বিদেশী সাহায্য আসবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

এখন দেখা যাচ্ছে, বানের জলের সঙ্গে ডলার নয়, এসেছে কুমির। এই কুমিরগুলো উগান্ডার অর্থনীতির হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। আফ্রিকার অন্য দেশগুলো বিদেশী সাহায্যের জন্য হাপিত্যেশ করে মরছে। এদিকে উগান্ডা বলছে- ঢের হয়েছে, বিদেশী সাহায্য আর নয়।

এক সময় আফ্রিকার অন্য ১০টি দেশের মতো উগান্ডায়ও এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোগের বিস্তার রোধ ও চিকিৎসার নামে পশ্চিমা দাতারা সাহায্য নিয়ে হাজির হয়। নানা রকম শর্তও চাপিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে কিছু দাতা এনজিওগুলোকে সরাসরি টাকা দিতে শুরু করে। এ টাকা দেয়া হয় উগান্ডার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পাশ কাটিয়ে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে। ফলে বিদেশী দানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বলতে কিছু ছিল না।

উগান্ডার অর্থ মন্ত্রণালয় জানেই না ঠিক কী পরিমাণ অর্থ এইডস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশে এসেছে। ধারণা করা হয়, এর পরিমাণ বছরে ১০ কোটি মার্কিন ডলার। মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৮.৯ কোটি মার্কিন ডলার। এই বিপুল পরিমাণ সাহায্য নিয়ে উগান্ডা সরকার অতীতে কখনো মাথা ঘামায়নি। এখন সরকারের চোখ বন্ধ থাকলে চলছে না। ১৯৯৮-৯৯ সালে উগান্ডার জিডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান ছিল ৬ ভাগ। বর্তমানে সাড়ে ১১ ভাগ। সরকার বলছে, তারা প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে বৈদেশিক সাহায্য কমিয়ে পুরনরায় ৬ শতাংশে ফিরে যাবে।

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তো সাহায্যের জন্য দাতাদের দুয়ারে ধরনা দিয়ে বসে থাকে। তাহলে বিদেশী সাহায্য গ্রহণে উগান্ডার এতো অনীহা কেন? উগান্ডা সরকারের অভিজ্ঞতা বলছে, বৈদেশিক সাহায্যনির্ভরতা দেশটির ব্যাস্টিক অর্থনীতির পরিবেশ বিনষ্ট করছে। ডলারের আগমনে দেশীয় মুদ্রা শিলিংয়ের অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে বটে। কয়েক বছর আগে ডলারপ্রতি শিলিংয়ের বিনিময় হার ছিল ২০০০, এখন ১৭৮০। কিন্তু রপ্তানিকারকরা হারাচ্ছে আগ্রহ। তাছাড়া বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা প্রবেশের ফলে পণ্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি কমাতে উগান্ডা সরকার ট্রেজারি বিলের সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। সাধারণ সুদের হার ১০-১২ শতাংশ হলেও বিগত বছরগুলোতে এ হার ২০ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে। যেসব ছোট ছোট রপ্তানিকারক নিজেদের ব্যবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন, তারা ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। উগান্ডার ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'প্রাইভেট সেক্টর ফাউন্ডেশন' এবং 'উগান্ডা প্রস্তুতকারক সমিতি' ইতিমধ্যে তাদের উদ্বেগ সরকারকে জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রপ্তানি না বাড়লে দেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অর্থ ঋণের দুষ্টচক্রে আটকে পড়া।

শিল্পোন্নত দেশসমূহের জোট জি-৭ এ বছর আফ্রিকার ঋণ মওকুফ, সাহায্য বৃদ্ধি এবং রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বহুল আলোচিত 'আফ্রিকা কমিশন'ও রয়েছে, যা আফ্রিকা মহাদেশের উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। আফ্রিকার জন্য ব্রিটেনের সাহায্য আসবে এ কমিশনের মাধ্যমে। পশ্চিমা দাতাদের আগ্রহে আফ্রিকার অন্য দেশগুলো খুশি হলেও উগান্ডা নাখোশ। দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের অভিমত, আফ্রিকা কমিশনের সাহায্যের আইডিয়াটা খারাপ নয়। তবে স্থান-কাল-পাত্র আলাদাভাবে বিবেচনা করে সাহায্য দেয়া উচিত। আফ্রিকার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পশ্চিমা সাহায্যে

সত্যিকার অর্থে কোনো টেকসই উন্নয়ন ঘটে না। কেবল স্বল্পমেয়াদি ত্রাণ কাজ যেমন- ওষুধ বিতরণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন কিংবা শিক্ষা খাতে কিছু তহবিল জোগাড় হয়।

বিদেশী সাহায্য যে আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি, সে কথাই বলেছেন উগান্ডার বুদ্ধিজীবী রবার্ট কানুশেঙ্গা। উদাহরণ দিয়েছেন ইথিওপিয়ার। 'ব্যান্ড এইড' দেশটিতে ২০ বছর ত্রাণ তৎপরতা চালানোর পরও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যে ১ কোটির বেশি ইথিওপিয়ান খাদ্যসংকটে ভুগেছে। আইরিশ গায়ক বব গেলডফ আশির দশকে 'তারা কি জানে আজ ক্রিসমাস?' (Do they know its Christmas?) গান গেয়ে লাখ লাখ ডলার জোগাড় করে ত্রাণ পাঠালেন ইথিওপিয়ায়। কিন্তু দেশটির সামগ্রিক পরিস্থিতির সত্যিকার কোনো উত্তরণ ঘটেনি। উপরন্তু, 'আফ্রিকা কমিশন' আসলে ব্লেয়ারের কদর্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভূমিকায় সাদা রঙ লাগানোর প্রচেষ্টা মাত্র।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, বিদেশী সাহায্য ছাড়া আফ্রিকার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অবস্থা সব সময় এমন ছিল না। উগান্ডার কথা ধরা যাক। স্বাধীনতার আগে দেশটিতে কোনো সাহায্য আসতো না। নিজের পায়েই দাঁড়িয়েছিল দেশটি। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থমকে দিয়েছিল উগান্ডার উন্নয়ন। দেশটির উত্তরে বিদ্রোহীরা দু' দশকের বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে। এমতাবস্থায়, বিদেশী সাহায্য এসেছে ঠিকই, কিন্তু দেশের উন্নয়ন হয়নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অকাতরে টাকা না বিলিয়ে পশ্চিমের উচিত সমস্যার গভীরে দৃষ্টি দেয়া। উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করা। দাতারা আফ্রিকার সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে প্রায়ই ভুল করে। সাহায্য কেবল ত্রাণ তৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কাঙ্ক্ষিত কাঠামোগত সংস্কার আর হয় না। আফ্রিকার দেশগুলোর মূল সমস্যা রাজনৈতিক। অধিকাংশ দেশেই চলছে গৃহযুদ্ধ এবং অধিকাংশ যুদ্ধে কোনো না কোনো পক্ষ পশ্চিমা মদদ পাচ্ছে।

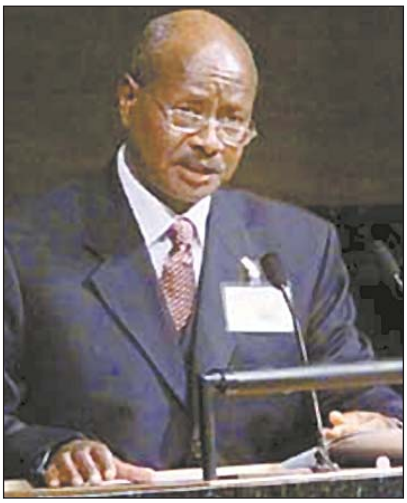

†cÖwm‡W›U Bqvwi gmy‡fwb : we‡`kx mvnvh¨ Kg‡eb

অধিকাংশ সংকটে দেখা যায়, সরকারবিরোধী পক্ষের অভিযোগ থাকে, তারা বঞ্চিত। দাতারা প্রাদেশিক সরকারগুলোকে সহায়তার মাধ্যমে এ সংকটের অনেকখানি সমাধান করতে পারে। অন্তত উগান্ডার ক্ষেত্রে তই ঘটতে পারতো। কিন্তু সমস্ত সাহায্য তারা সীমাবদ্ধ রেখেছিল রাজধানী কাম্পালাতে। প্রাদেশিক সরকার বা বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার করেনি। ফলে সংকটের সমাধান হয়নি। সাহায্য সব জলে গেছে। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে এমনটাই ঘটছে।

সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে উগান্ডা তাই নিজস্ব সম্পদের ওপর জোর দিচ্ছে। যেমন- দেশটির পর্যটন শিল্প। ষাট ও সত্তরের দশকে পর্যটন ছিল উগান্ডার বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস। পরবর্তীতে স্বৈরশাসক ইদি আমিন বন ধ্বংস করে 'গেম পার্ক' নির্মাণ করলে অসংখ্য বণ্য প্রাণী মারা পড়ে, পরিবেশ বিপন্ন হয়। ইদানীং আবার পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। সরকারের আশা, জিডিপির বৈদেশিক সাহায্যের অংশটুকু তারা এক সময় পর্যটন থেকেই পূরণ করতে পারবে। উপনিবেশ-উত্তর আফ্রিকায় এবং তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভরতা নব্য ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। উগান্ডার আত্মনির্ভরতার প্রচেষ্টা সেখানে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে।

আসামে 'বাংলাদেশী' বিতাড়নের নেপথ্যে

Zi“Y M‰M

মুক্তি চৌধুরী, *কোলকাতা থেকে*

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে চলছে 'বাংলাদেশী' অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে 'বাংলাভাষী' বিতাড়ন। অসমিয়া আন্দোলনকারীরা ৭ দিনের মধ্যে এসব 'বাংলাদেশী'কে আসাম ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। ডাক দিয়েছে 'বাংলাদেশী'দের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের। আসামের কেনো কোম্পানিতে যেন বাংলাভাষীদের নিয়োগ দেয় না হয়, সে আহ্বানও জানিয়েছে অনেক সংগঠন।

অসমিয়াদের হুমকিতে আসামের ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও জোড়হাট জেলা থেকে পালিয়ে গেছে অসংখ্য বাংলাভাষী। 'হিন্দুস্তান টাইমসের' হিসাবে এ সংখ্যা ১০ হাজার, 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার' হিসাবে ১৫ হাজার। আসাম রাজ্য সরকারের হিসাবে অবশ্য এ সংখ্যা মোটে ৫০০।

আসামের বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে মূলত 'চিড়িং চাপারি যুব মঞ্চ' নামে একটি ভুঁইফোড় সংগঠন। মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে তারা জনমত গঠনের চেষ্টা করছে। আন্দোলনের মুখে বাংলাভাষীদের পালিয়ে যাওয়ার কথা রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ স্বীকার করেছেন। এ স্বীকারোক্তির কারণে অবশ্য তাকে 'আসামের শত্রু' আখ্যায় দেয়া হয়েছে। স্লোগান উঠেছে, 'বাংলাদেশীদের গোলাম তরুণ গগৈ'।

'বাংলাদেশী' বিতাড়নের এ হুজুগ ওঠে আসামের রাজ্যপালের এক গোপন রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পর। আসামের রাজ্যপাল অজয় সিং দিল্লিতে রাজ্যপালদের সম্মেলনে পেশ করার জন্য রিপোর্টটি প্রস্তুত করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিদিন সীমান্ত পেরিয়ে ৬ হাজার অনুপ্রবেশকারী আসামে প্রবেশ করছে। যদিও রাজ্যের ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী পরে, রিপোর্টটি ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা দেন।

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এবং রাজ্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, যারা পালিয়ে গেছেন তারা 'বাংলাদেশী' নন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, ২০০৭ সালের আসাম বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপির মদদে আন্দোলনে নেমেছে 'যুব মঞ্চ'। কারণ কংগ্রেসের একটি বড় ভোট ব্যাংক রয়েছে রাজ্যের সংখ্যালঘু বাংলাভাষীদের মধ্যে। সেই ভোট ব্যাংকে আঘাত হানাই বিজেপির গেমপ্ল্যান।